প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যা

ইউনিট ৫

বাংলায় প্রাচীনকালে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক রূপের কিছু প্রকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগকে তাই রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগের সময় থেকে খ্রিস্টীয় তের শতকের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই হাজার বছর সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কিছু দিক নিয়েই এ ইউনিটে আলোচনা করা হলো।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ ঃ প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

পাঠ-৫.২ ঃ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৫.১ প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনবসতি, বর্ণপ্রথা, নারী, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিল্প, মুদ্রা, খনিজ সম্পদ

জনবসতি

বাংলায় জনবসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে। নানা জাতিগোষ্ঠী যেমন, নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালোপাইন, আর্য, মঙ্গোলীয়, শক, তুর্কি, আরব, পাঠান, হাবশ, কোচ, রাজবংশী, পর্তুগিজ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বাংলার জনস্রোতে মিশেছিল। অস্ট্রিকরাই এখানে কৃষি ও পশুপালনের সূচনা করেছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ড ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিকদের বংশধর। দ্রাবিড়দের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে।

প্রাচীন জনপদগুলোর সমাজব্যবস্থা

দলবদ্ধ জীবনই সমাজ। প্রাচীন বাংলায় কোম বা গোত্র হচ্ছে সংগঠিত প্রথম দলবদ্ধ সমাজ। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোম জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। কোমগুলো একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান তেমন ছিল না। নানা ধরনের বাধা, বিধিনিষেধ ছিল। কোমবদ্ধ সমাজে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল যা ছিল একান্তই আদিম।

আদিতে শিকার, কোম কৃষি এবং ক্ষুদ্র গৃহশিল্পই ছিল সামাজিক সম্পদের প্রধান উৎস যা কোমের সদস্যরা ভাগাভাগি করে নিত। অবশ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক আদান-প্রদান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছোট-বড় কোমের সমবায়ে বৃহত্তর সমাজ যেমন পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে। বাংলায় প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমগোষ্ঠী ক্রমেই বৃহত্তর শংকর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিস্তার ঘটায়। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। তবে এগুলোতে গৃহশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উদ্ভব ঘটেছিল। জনপদগুলোতে রাষ্ট্রের কিছু দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। কারণ দুর্ভিক্ষ হলে রাজাগণ জনকল্যাণের চিন্তা থেকে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে ফসল, শস্যবীজ বিলিয়ে দিতেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কিছুটা উত্তর–ভারতীয় নগরসভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল।

বর্ণ-প্রথা ও প্রাচীন বাংলার সমাজ

কোনো সমাজে বর্ণপ্রথা একেবারে শুরুতে থাকে না। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তার হিসেবেই বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এ বর্ণপ্রথার ভাবাদর্শে পুষ্ট হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মতোই বাংলা ভূখণ্ড বর্ণশ্রম এবং বিভক্তির সর্বগ্রাসী ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র —এ চতুর্বর্ণের প্রথাকে আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের লেখকরা ভূমিকা রাখেন। বিচিত্র সব বর্ণ, উপবর্ণ ও শংকর বর্ণের সামাজিক বিন্যাস এতে গুরুত্ব পায়। এভাবে বর্ণভেদ প্রথা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে প্রতিষ্ঠা পায়। নিম্নবর্ণের ডোমদের বাস ছিল গ্রামের বাইরে। উচ্চবর্ণের লোকেরা এঁদের ছুঁতেন না।

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান

তাঁত বোনা

আজও বাংলার গ্রামদেশের মেয়েদের মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কামনা-বাসনা দেখা যায়, প্রাচীন যুগের বাংলায় মোটামুটি সেই আদর্শই পালিত হতো। পাল ও সেন আমলের লিপি দেখে মনে হয় লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুন্ধরার মতো সর্বংসহা, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালি নারীর আদর্শ। স্ত্রী হবেন বন্ধুর মতো এবং স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় নারী পুরুষের বৈষম্য একটি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে ধনী পরিবারের নারীদের অবস্থান গরীবদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। বর্ণপ্রথার কারণে অসবর্ণ বিবাহ সমাদৃত ছিল না। পাল ও সেন আমলে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মা ও স্ত্রীদের সম্মান বেশ উঁচুতে ছিল। সুতা কাটা, তাঁত বুনা, অন্যান্য গৃহশিল্পকর্মে নিয়োজিত হতো দরিদ্র পরিবারের নারীরা। সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্র বিয়ে করা। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিধবাজীবন নারীদের জন্য প্রাচীন বাংলায় অভিশাপ হিসেবে ছিল। এ কারণে সহমরণ উৎসাহিত হয়। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া করত। রাজপরিবারেও নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত না, ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন সেখানেও অবধারিত ছিল। কিন্তু হতদরিদ্র ঘরের মেয়েদের শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো, তাই তাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল না।

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি

কৃষি অর্থনীতি

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার দিকে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি এবং ছোটখাট গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাস এবং গৃহশিল্প ছাড়াও ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে বার শতক অবধি বাঙালিগণ মূলতই কৃষি নির্ভর ছিল। প্রাচীন বাংলায় গ্রামই ছিল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। মূলত ধান, তরিতরকারি, ফলমূল, ফুল, সরিষা ও আখ চাষাবাদ করে দেশের মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এখানে প্রচুর আখ উৎপাদিত হতো এবং আখ থেকে গুড় উৎপাদন করে

বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। কাঠ এখানকার মানুষের একটি অর্থকরী সম্পদ ছিল। সুপারি আর নারিকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে আঁকা ছবিতে কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। জমির কর্তৃত্ব ছিল রাজাদের হাতে। বিভিন্ন ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে এসব জমি ইজারা নেওয়া হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত। প্রাচীন বাংলার মানুষ ভাত, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, দই, ঘি, খির, মাংস, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। তখন রানাবান্নায় প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হতো। গ্রামেগঞ্জে উৎসবে পিঠা, মুড়ির প্রচলন ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প

প্রাচীন বাংলায় শুধু দেশের ভেতরে ব্যবসায়-বাণিজ্য হতো তা নয়, বিদেশের হাটেবাজারেও জিনিসপত্র রফতানি হতো। গ্রামাঞ্চলের হাটে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের কেনাবেচা চলত। দেশের ভেতরে নৌযোগে বেচাকেনা হতো। ফলে গড়ে ওঠে হাট-বাজার, গঞ্জ ও নতুন নতুন শহর। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রায় সুতি কাপড় ও মুক্তা রফতানি করা হতো। স্থলপথে আসাম, মায়ানমার, চীন, ভূটান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যের কারণে বাংলার সম্পদ প্রাচীন যুগে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন যুগেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কোটিল্য চার প্রকারের বস্ত্রের কথা লিখেছেন। মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিল। কারণ পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে পোড়ামাটির থালা, পানির পাত্র, দোয়াত ও প্রদীপ পাওয়া গেছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তার প্রচলন ছিল। কাঠ ও নৌকা শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে মাঝি, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মণিকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা ও সংঘের সৃষ্টি হয়। হাতির দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নৌকা ও জাহাজ তৈরি হতো। মৌলভীবাজার জেলার ভাটেরা তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাঁসারির উল্লেখ থেকে কাঁসাশিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও ধাতুর তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে। লোকজন নৌকা এবং সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যবসায় জড়িত ছিল। যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও নৌবহরের উপর সামরিক শক্তি নির্ভর করত।

প্রাচীন মুদ্রা ও খনিজ সম্পদ

বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ছাপকাটা মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মৌর্য যুগেও মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ যুগের কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। দীর্ঘদিন এখানে কড়িরও প্রচলন ছিল। প্রাচীন যুগে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পৌন্ড্রদেশ একসময় হিরার জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্য বাংলায় হিরার খনির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত সোনারগাও, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস জড়িত। ত্রিপুরার যে সব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করতে আসত, তারা টুকরো টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেত প্রবাল, চুম্বক পাথর ও সামুদ্রিক শঙ্কের মালা। সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। গৌড়দেশে তখন রূপাও পাওয়া যেত। একটি পুথিতে রাঢ়দেশে লৌহখনির কথা আছে। লোহা দিয়ে দা, কুড়াল, লাঙল, তীর, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি তৈরি হতো। তের শতকের গোড়ার দিকে জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসে এখানকার দুমুখো ধারালো তলোয়ারের খুব তারিফ করেছেন।

প্রাচীন যুগের মুদ্রা

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	প্রাচীন বাংলার সমাজে বর্ণপ্রথাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর শিক্ষার্থীগণ একটি ছোট নাটিকা তৈরি করে ক্লাসে প্রদর্শন করবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় প্রথমদিকে অস্টিক, দাবিড় সহ নানা জাতিগোষ্ঠী বাস করত। এসব জাতিগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা ছিল কোম বা গোত্র। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। এ সমাজে যেমন ছিল উচুঁ-নিচু শ্রেণি, তেমনি ছিল নারী-পুরুষের বৈষম্য। তবে মা ও স্ত্রীদের সম্মান করা হতো। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর ও গ্রামভিত্তিক হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। বিভিন্ন যুগে মুদ্রার পাশাপাশি খনিজ সম্পদের কথাও জানা যায় যেমন, সোনা, রূপা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাচীন বাংলায় গ্রাম্য উৎসবে কিসের প্রচলন ছিল?
ক) দুধ ও মুড়ি খ) পিঠা ও পায়েস
গ) আম ও চিড়া ঘ) পিঠা ও মুড়ি

২। গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরটির নাম কী?
ক) গঙ্গে খ) তাম্রলিপ্তি
গ) মংলা ঘ) নারায়ণগঞ্জ

৩। প্রাচীন বাংলায় আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল–
ক) দাসপ্রথা খ) জাতিভেদ প্রথা
গ) সতীদাহ প্রথা ঘ) বর্ণভেদ প্রথা

৪। প্রাচীন বাংলার যে শিল্প দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে– (অনুধাবন মূলক)
ক) মৃৎ শিল্প খ) বস্ত্র শিল্প
গ) কারু শিল্প ঘ) স্বর্ণ শিল্প

৫। প্রাচীন পুঁথিতে লোহার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়–
i) রাঢ় ii) বঙ্গ iii) সমতট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। প্রাচীনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে কোনটি প্রচলিত ছিল?
ক) দাস প্রথা খ) কর প্রথা
গ) বিনিময় প্রথা ঘ) মালজামিনী প্রথা

৭। বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কারণ কোনটিকে বলা যায়?
ক) বাণিজ্যিক প্রসার খ) কৃষির উন্নতি
গ) জীবন মাত্রার মান বৃদ্ধি ঘ) শিল্পের উৎকর্ষতা

পাঠ-৫.২ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার ধর্ম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিল্পকর্ম, ওয়ারী-বটেশ্বর, টেরাকোটা ফলক

বাংলার আদিবাসী মানুষের ধর্মকর্মের ছবি ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তার ওপর একেক বর্ণ, একেক শ্রেণি, একেক কোম, একেক জনপদে ভয়ভক্তি পূজোঅর্চনার একেক রকম রূপ। একের ধারণা আর অভ্যাস কখনও অবিকলভাবে, কখনও বা তাতে রং লাগিয়ে অপরে গ্রহণ করে। এই দেয়া-নেয়ার কাজটা চলে লোকচক্ষুর আড়ালে। অবিরাম এই দেয়া-নেয়ার ফলেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্ম। হিন্দু জন্মান্তরবাদ, পরলোকে বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির অনেক কিছুরই মূলে আছে আদিবাসীদের ধ্যান-ধারণা। গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের আদিমতম ভয়, বিস্ময়, বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদি বাঙালির ধর্মের পুরো ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন যুগের এসব বিশ্বাস ও আচারে বাঙালির ধর্মের জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব বার শতকের আগে বাংলার লোকালয়ের বাইরে গ্রাম-দেবতার অবস্থিতি ছিল, নানা ধরনের পূজো প্রচলিত ছিল। এ সবই কোম সমাজের পূজো। চাষাবাদের সাথেও নানা ধরণের দেবদেবীর পূজো জড়িত ছিল। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আদি যুগেরই অবদান। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল ব্রত যা শিবপূজা যা মধুসংক্রান্তি নামেও পরিচিত। কোমদের দেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর। বাংলার কৃষি সমাজে ভাল ফসলের আশায় হোলি উৎসব পালন করা হতো। এ ছাড়া মনসা পূজা, জাঙ্গুলী দেবীর পূজা, পর্ণশবরী শারবোৎসব, ঘটলক্ষ্মী, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি আর্যপূর্ব কৌম সমাজের অবদান। তবে প্রাক-গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে বাংলায়। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করেছিল। এছাড়া পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম (হিন্দু ধর্মের বিশেষ শাখা) ও সহজিয়া ধর্মের প্রভাবও বাংলায় ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দুধর্ম

আর্যদের বিভিন্ন বিশ্বাস, পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দেব-দেবীদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠ করত, বিভিন্ন ফল, দুধ, ঘি, শস্য, রস, মাংস আহুতি দিত। মূলত দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। পরে বলিদান অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এবং সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বড় হয়ে ওঠেন। সেন আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়। এই রাজবংশের রাজারা মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের জমি দান করে পূজোঅর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর্যদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এটি লিখিত ছিল না। বহুকাল মানুষ মুখে মুখে যা বহন করে আনে। পরে তা ঋগ্বেদ গ্রন্থ লেখা হয়। বেদ মানে হচ্ছে 'জ্ঞান'। পুরোহিতরা অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে দেবতার চেয়েও বেশি ক্ষমতার আসন লাভ করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্র দায়িত্বকে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসে স্থান দেয়ার নামই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। এটি একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে চারটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে ব্রাহ্মণরা বৈশ্য ও শূদ্রদের হেয় জ্ঞান করে। এর থেকেই এক সময় নিম্ন বর্ণের মানুষেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেন যুগে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের স্থান দখল করে নেয়। তবে হিন্দু ধর্ম কোনো একক ধর্ম নয়, এটি অসংখ্য বিশ্বাস, আচার ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বয়ে গঠিত সনাতন ধর্ম। তবে এতে তিনটি বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়-

(১) গাভী ভক্তি, (২) আত্মার পুনর্জন্ম এবং (৩) ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব । হিন্দুধর্ম তিনভাবে দেবত্ব বিশ্বাস করে– (১) স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, (২) সংরক্ষক হচ্ছে বিষ্ণু ও (৩) শিব হচ্ছেন ধ্বংসকারী। মানুষ এবং প্রাণির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। কেননা, উভয়েরই আত্মা আছে। এ কারণেই গরু, হাতি ও কুমির ইত্যাদি প্রাণিকে হিন্দুধর্মের অনুসারীরা দেবত্বের সম্মান দেন। সেন বংশের রাজত্বকালের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। বর্মণ বংশের রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। নানা বিশ্বাস, বিভাজন, আচার, পূজা, দেবদেবী, লৌকিকতা মিলিয়ে বাংলায় হিন্দুধর্ম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা নিয়ে প্রাচীন যুগের শেষ বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে দুর্গাপূজা সার্বজনীন পূজোৎসব হয়ে আছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-বাংলায় জৈন ধর্মের প্রসার হয়েছিল। আর মৌর্য সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন বাংলায় এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দেখেছেন, সমতটের ত্রিশটি বিহারে দু-হাজার শ্রমণের বাস। অষ্টম শতকে পাল যুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলো ঐ পর্বের বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। আচার্যগণ জ্ঞান-সাধনা এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন যার অধিকাংশই তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মেরও রূপ বদলে সহজিয়া পরিচয় লাভ করেছে। বাংলার আউল-বাউলরা বাংলার সেই সহজিয়া ধর্মেরই ধারক-বাহক। সেন-বর্মণ পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক দিনের। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের বলেছেন 'পাষণ্ড' যা সংঘর্ষের প্রমাণ। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। বৌদ্ধ বিহারে এর পরেও যা অবশিষ্ট ছিল, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কি আক্রমণের মুখে তাও ধুয়ে মুছে গেল।

শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার শিল্পকর্ম

বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। বাংলার শিল্পরীতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে। ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিহার। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত বিহারগুলো ছিল মূলত ভিক্ষুসংঘের বাসগৃহ। প্রত্ন-খননের ফলে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকটে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে এবং কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে কতকগুলো বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগর পুণ্ড্রনগর। এখানে বাংলার প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার নানা নিদর্শন মেলে। প্রাচীনযুগের ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্য নিদর্শন উৎঘাটিত হয়েছে।

আট শতকে ধর্মপাল বরেন্দ্রীতে এক বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন বলে অনুমান করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ এই বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীতে এ যুগের শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের সবচেয়ে বড় প্রত্নস্থল ময়নামতি। সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যে লালমাই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও ভোজবিহার। খড়্গ, দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কীর্তি আমাদের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। দেব রাজাদের রাজধানী দেবপর্বত লালমাই এলাকাতেই অবস্থিত ছিল। ময়নামতির প্রত্নসামগ্রী দক্ষিণ পূর্ব বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রত্ননিদর্শনাদি প্রাচীন বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তি বলে সনাক্ত হয়েছে। তাম্রলিপ্তিকে অনেকেই গ্রিক, লাটিন বিবরণীর "গাঙ্গে" বন্দর বলে মনে করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ, আর এই ধ্বংসাবশেষের পাশেই ছিল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড় বহন করছে অধিষ্ঠান কোটিবর্ষ নগরের চিহ্ন।

তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা : ওয়ারী-বটেশ্বরের আবিষ্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর ও কোপাই বঙ্গেশ্বর নদীর তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ অঞ্চলে তাম্র যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ থেকে বলা যায় যে, প্রায় ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে যে সভ্য জাতির বাস ছিল তার সমসাময়িক কালে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও উন্নত সভ্যতা ছিল।

ওয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশের নতুন প্রত্নস্থলের নাম ওয়ারী-বটেশ্বর। ঢাকা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় ওয়ারী বটেশ্বরের অবস্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর ভাষ্য অনুসারে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী কিছু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় ওয়ারী বটেশ্বরকে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ থাকলেও সবাই মনে করছেন প্রাচীন সভ্যতার নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। খনন ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস হয়ত ভবিষ্যতে নতুন করে লিখতে হবে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মন্দির ও টেরাকোটা ফলক

বাংলাদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্য প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। স্থাপত্য বা স্তুপ হলো বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। বৌদ্ধগণই স্তূপ-নির্মাণের রীতিকে গ্রহণ করে পূজা-অর্চনায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এ রীতিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। বৌদ্ধ-প্রধান অঞ্চল ময়নামতিতে দশ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে। বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট রীতির স্থাপত্য-নিদর্শন হল মন্দির। ময়নামতিতে মন্দিরের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। শালবন বিহারের কেন্দ্রিয় মন্দিরটির প্রত্যেক বাহু ১৭০ ফুট দীর্ঘ। প্রাচীন যুগের কয়েকটি মন্দিরই জীর্ণ ও ভগ্ন শরীরে বিদ্যমান।

পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক

প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। মহাস্থান, তমলুক ইত্যাদি স্থানে গুপ্ত যুগের আগের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী খোদিত আছে। প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির কাজ জনপ্রিয় ছিল। কাদামাটি দিয়ে নির্দশন তৈরি করে রোদে শুকিয়ে পোড়ালে পরিবর্তিত যে রূপ তাকে আমরা সাধারণত পোড়ামাটির কাজ বলি। নাগরিক জীবনে এ পোড়ামাটির ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'টেরাকোটা' শব্দটি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। প্রচলিত অর্থে টেরাকোটা বলতে মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির পুতুল ও ক্ষুদ্রাকার অস্থাবর ফলক এবং দেয়ালগাত্রে অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির ফলককে বুঝানো হয়। ময়নামতি, পাহাড়পুর ও ভাসুবিহারের মতো ধর্মীয় চেতনায় নির্মিত স্থাপত্য দেয়ালের টেরাকোটা ফলকে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ ওয়ারী-বটেশ্বর এর উপর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলায় নানা ধরনের ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল শিবপূজা। প্রাক গুপ্ত যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার দেখা যায়। এ সময়ের বাংলার শিল্পকর্মে যেমন ভাস্কর্য, টেরাকোটার সন্ধান পাওয়া যায়। তেমন এর মাধ্যমে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, কল্পনা, ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। শিল্পকর্মের সবচেয়ে বড় নিদর্শন মহাস্থানগর। ওয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া গেছে আরো প্রাচীন নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাল যুগে কোন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে?
- ক) ব্রাহ্মণধর্ম
- খ) বৌদ্ধধর্ম
- গ) জৈনধর্ম
- ঘ) খ্রিষ্টানধর্ম

২। দেব পর্বত কোথায় অবস্থিত?
- ক) পুন্ড্রনগরে
- খ) চন্দ্রদ্বীপে
- গ) পাহাড়পুরে
- ঘ) ময়নামতিতে

৩। ওয়ারী বটেশ্বর আবিষ্কার, প্রমাণ করে–

i) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল গ্রাম কেন্দ্রীক

ii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল নগর ভিত্তিক

iii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল উন্নত সভ্যতার ধারক

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৪। কুমিল্লা জেলার কোথায় ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে?
- ক) মোহনপুরে
- খ) মুরাদনগরে
- গ) রামচন্দ্রপুরে
- ঘ) ময়নামতিতে

৫। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন কবে?
- ক) ৬০৬ খ্রিঃ
- খ) ৬১৯ খ্রিঃ
- গ) ৬৩৭ খ্রিঃ
- ঘ) ৬৩৯ খ্রিঃ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ